আবিষ্কারের মাইলফলক

প্রদীপ দেব

প্রথম পর্ব

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ লক্ষ বছর - খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ সাল

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি (পনের বিলিয়ন) বছর আগে মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং (Big bang) এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই মহাবিশ্ব। তখন মহাবিশ্ব ছিলো প্রচন্ড উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড। গ্যালাক্সি, সৌরজগৎ বা গ্রহ উপগ্রহের আলাদা আলাদা কোন অস্তিত্ব তখন ছিলো না। তারপর একহাজার কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হতে হতে সে গ্যাসপিন্ড আস্তে আস্তে কঠিন রূপ ধারণ করেছে, তৈরি হয়েছে গ্যালাক্সি, সৌরজগৎ সহ গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। প্রায় সাতান্ন কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটে। তারপর প্রাকৃতিক বিবর্তনের অনেক রকম পথ পেরিয়ে হোমো সেপিয়ান্স বা মানুষের জন্ম।

মানুষ বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সংগ্রাম করতে শিখেছে। তাদের প্রথম সংগ্রাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে। প্রকৃতি মানুষকে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষ প্রকৃতিকে তার চেয়েও বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে অনবরত। এ যুদ্ধে কখনো প্রকৃতি জেতে, কখনো মানুষ। এভাবেই মানুষ তৈরি করে নিয়েছে সৃষ্টিকর্তার ধারণা, তৈরি করেছে নানারকম মতবাদ। অনবরত ভাঙাগড়ার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে সাজিয়ে নিয়েছে তাদের মনের মত করে। মানুষের প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রযুক্তি, সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান - যার ফলশ্রুতি আজকের আধুনিক পৃথিবী।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া নানারকম তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় আধুনিক মানুষ বা হোমোসেপিয়ান্স এর আগের প্রজাতি হোমো-ইরেক্টাসের সময় থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে পৃথিবীতে। তারপর মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে চলেছে নতুন নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এর মধ্যে কিছু কিছু আবিষ্কার বদলে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি, বদলে দিয়েছে হাজার বছরের পুরনো ধারণা। এরকম আবিষ্কারগুলোকে আমরা বলতে পারি আবিষ্কারের মাইল ফলক। আবিষ্কারের মহাসড়কে প্রথম মাইল ফলকটি প্রোথিত হয়েছিলো খ্রিস্টপূর্ব পাঁচলক্ষ বছর আগে প্রাকৃতিক আগুন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

আগুনের ব্যবহার

আগুনকে সকল প্রযুক্তির প্রাণ বলা যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক আগুন সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে প্রকৃতিতে। বুদ্ধিমান প্রাণীরা খেয়াল করে দেখেছে এই আগুনের শক্তি, দেখেছে আগুনের তাপ ও আলো বিকিরণের ক্ষমতা। চেষ্টা করেছে আগুনের এই ক্ষমতাকে জয় করে কাজে লাগানোর। হোমো ইরেকটাস প্রজাতির প্রাণীরা সক্ষম হয়েছে প্রাকৃতিক আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাতে।

মানুষ বা হোমোসেপিয়ান প্রজাতির ঠিক আগের প্রজাতি হলো হোমো ইরেক্টাস (Homo erectus)। খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছর সময়ের মধ্যে হোমো ইরেক্টাস প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিলো। চীনের বেইজিংয়ের কাছে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুহায় পাওয়া নিদর্শন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় - আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেক্টাস প্রজাতি প্রাকৃতিক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রযুক্তি অর্জন করেছিলো। পরবর্তীতে এ প্রযুক্তি আরো ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে হোমোসেপিয়ানরা।

আগুন জ্বালানো, আগুনকে কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন শেষে আগুন নেভানোর পদ্ধতি মানুষের আয়ত্বে আসার সাথে সাথে সভ্যতার বিরাট একটি ধাপে উত্তরণ ঘটলো মানুষের। আগুন ব্যবহার করে মানুষ রান্না করতে শিখলো, শিকার করার জন্য অস্ত্র তৈরি করতে শিখলো, শীত নিবারণ করতে শিখলো - প্রাকৃতিক আগুনকে বশে এনে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কাজে আগুনকে ব্যবহার করতে শুরু করলো। আগুনের ব্যবহার হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রথম মাইল ফলক।

সেচ ও কৃষিকাজের শুরু

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগ পর্যন্ত (খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার বছর) মানুষ খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। জীবজন্তুর মাংসই ছিলো তখনকার মানুষের প্রধান খাদ্য। জীবজন্তুরা দলবেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় - আর মানুষ তাদের অনুসরণ করে। জীবজন্তুর মতো মানুষেরও গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রচলন শুরু হয়। একেক দল একেক স্থানে কিছুদিনের জন্য আবাস গড়ে তোলে। আশেপাশের পশুপাখি ও ফলমূল শেষ হয়ে এলে সে জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এরকম যাযাবরবৃত্তি চলেছে অনেক বছর ধরে।

কিন্তু মানুষ ভাবতে শেখে - এভাবে খাদ্যের পেছনে না ঘুরে খাদ্য উৎপাদন করলে কেমন হয়। ঠিক কীভাবে এবং কেন এ চিন্তা মানুষের মনে এলো তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে মানুষ জীবজন্তুর চেয়ে নিজেদের বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে শুরু করেছিলো এবং জীবজন্তুর চেয়ে আলাদা জীবন যাপন পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলো।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও গবেষণা থেকে দেখা যায় বর্তমান উত্তর ইরাকের কাছে প্রাচীন যাযাবর নোম্যাডরা সেচ ও কৃষিকাজ শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব আটহাজার থেকে পাঁচহাজার বছরের মধ্যে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে মানুষ দেখেছে বীজ মাটিতে পুঁতে রাখলে সেখান থেকে নতুন চারা জন্মে। পরিকল্পিত ভাবে বীজ রোপন ও তাতে সেচের ব্যবস্থা শুরু হয়। মানুষ দেখেছে বৃষ্টির পানি উঁচু ভূমি থেকে গড়িয়ে নিচু ভূমির দিকে যায় এবং সেখানে জমা হয়। মানুষ চিন্তা করে দেখলো যে শস্যক্ষেতে পানি সরবরাহের জন্য শুধুমাত্র বৃষ্টির ওপর নির্ভর করার দরকার নেই। যেখানে পানি জমে থাকে সেখান থেকে খাল কেটে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে আস্তে আস্তে কৃষিকাজ ও সেচ পদ্ধতিতে দক্ষ হয়ে উঠলো মানুষ।

চাষাবাদের পাশাপাশি পশুপালনও শুরু হলো। আস্তে আস্তে যাযাবর মানুষ ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলো। শুরু হলো কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সমাজব্যবস্থা।

ধাতব যুগ

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীতে নানারকম পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মানুষ বা মানুষের আগের প্রজাতি - এসব পাথরের ব্যবহার করতে শিখেছে আগুন ব্যবহারের অনেক আগে। পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো শিখেছে - পাথর দিয়ে পাথর ভেঙ্গে পাথুরে অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে নিজেদের প্রয়োজনেই। আগুনের ব্যবহার শুরু হবার পর পাথরের ব্যবহার আরো সহজ হয়ে যায়।

পাথর খুঁজতে খুঁজতে মানুষ নানারকম ধাতব পদার্থও আবিষ্কার করতে আরম্ভ করে মাটি ও পাথরে মিশ্রিত অবস্থায়। আগুনে পুড়িয়ে পাথর থেকে ধাতব পদার্থ আলাদা করে ফেলার পদ্ধতিও শিখে ফেলে মানুষ। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচহাজার বছরের দিকে মানুষ খনিজ পাথর থেকে তামা আলাদা করতে শিখে যায়। তামা মিশ্রিত খনিজ পাথর কাঠের আগুনে পোড়ালে কাঠ থেকে কার্বন আলাদা হয়। সে কার্বন খনিজ পাথরের অক্সিজেনের সাথে মিশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে গেলে অবশেষ হিসেবে

পড়ে থাকে তামা। বার বার করতে করতে মানুষ খনি থেকে তামা বের করার পদ্ধতিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। ঠিক কীভাবে এ আবিষ্কার তারা করেছিলো তা আমরা জানিনা - তবে ধারণা করা হয় আগুনে পুড়িয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতেই এ আবিষ্কার তারা করতে পেরেছে। আর তা চলেছে অনেক অনেক দিন ধরে।

তামা আবিষ্কার করতে পারার সাথে সাথেই তামার ব্যবহার শুরু হয়ে গেলো। তামা দিয়ে তৈরি হতে লাগলো দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী। তবে তামার ব্যবহারে একটা অসুবিধা দেখা গেলো - তাহলো তামা খুব নরম, সামান্য আঘাতেই বেঁকে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা দেখলো যে একপ্রকার তামা খুব শক্ত। এই শক্ত তামা আসলে তামা ও টিনের সংমিশ্রণ। তামার সাথে টিন মেশানো থাকলে হয় কাঁসা। এরপর ব্যাপক হারে কাঁসার ব্যবহার শুরু হয়ে গেলো।

নানারকম পাথর আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার শুরু হয়ে গেলো। মানুষ আবিষ্কার করলো টিন, লোহা, সীসা, সোনা ইত্যাদি। নানারকম ধাতু মিশিয়ে তৈরি করতে শিখলো নিজেদের প্রয়োজন মত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী। শুধুমাত্র কাঠের আগুনে পুড়িয়ে পাথর ও অন্যান্য ধাতু গলানো হতো তখন। কিন্তু কাঠের আগুন থেকে যে তাপ তৈরি হয় তা অনেক ক্ষেত্রে ধাতু গলানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়। কাঠের আগুন নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে আরো একটি ব্যাপার আবিষ্কৃত হলো - তাহলো খুব কম বাতাসে কাঠ পোড়ালে কাঠ কয়লায় পরিণত হয় এবং এই কয়লার আগুনে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা স্বাভাবিক আগুনের তাপের চেয়ে বেশি। কয়লার আগুনের প্রচন্ড তাপে বেশির ভাগ ধাতুই গলে যায়। এভাবে লোহার আকরিক গলিয়ে লোহা আলাদা করার সময় কাঠকয়লার কিছু কার্বন লোহায় মিশে তৈরি হলো লোহার চেয়ে অনেক শক্ত একপ্রকার ধাতু - ইস্পাত। লোহা ও ইস্পাতের আবিষ্কার ও ব্যবহার - প্রযুক্তির পথে নতুন মাইলফলক।

সময় মাপার ধারণা ও ক্যালেন্ডার

সময় মাপার ধারণা সভ্যতার দিকে মানুষের একটি বড় পদক্ষেপ। আর এ পদক্ষেপটি প্রথম রূপলাভ করে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর সময়ের দিকে প্রাচীন মিশরীয়রা সময় মাপার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা আবিষ্কার করে। দিনের বেলা সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তারা দিনকে সমান বারোটি ভাগে ভাগ করে নেয়। এক একটি ভাগের পরিমাণ হলো এক ঘন্টা। সে হিসেবে রাতেও বারো ঘন্টা এবং দিন রাত্রি মিলিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় একদিন।

সময়কে আরো সূক্ষ্মভাবে মাপার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় আরো পরে - খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার আট শ সালের দিকে। অনেক বছর থেকেই মিশরীয় ধর্মযাজকরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে প্রায় প্রতি ৩৬৫ দিন পর পর নাইল (Nile) নদী প্লাবিত হয়। তাঁরা এ ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করান এভাবেঃ সূর্য ৩৬৫ দিন পর পর স্বর্গের কাছাকাছি চলে আসে। এখানে বলা প্রয়োজন যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির শুরু থেকেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার ধারণা তৈরি করে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুরু করে। স্বর্গ নরকের ধারণাও প্রায় তখন থেকেই শুরু। নতুন কোন কিছু দেখলেই মানুষ তা সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়ার দান হিসেবে চিহ্নিত করে। পরে ঘটনার কারণ বুঝতে পারলে তা সহজ প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবেই মেনে নেয়। তাই অতীতের প্রায় সব প্রাকৃতিক ঘটনার বিশ্লেষণেই সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গ নরক, দেবতাদের ভূমিকা খুব বেশি করে উল্লেখ করার প্রবণতা ছিলো।

শুধু দিনের বেলার সূর্য নয়, রাতের চাঁদকেও পর্যবেক্ষণ করে মিশরীয়রা বারো মাসে এক বছর আর ত্রিশ দিনে এক মাস হিসেবে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে। প্রতি মাসে ত্রিশ দিন হিসেবে বারো মাসে হয় ৩৬০ দিন। তাতে ৩৬৫ দিনের বছরে পাঁচ দিনের পার্থক্য থেকে যায়। এ পার্থক্য ঘোচাতে প্রতি ছয় বছর পর পর তাঁরা বছরের সাথে পুরো একটি নতুন মাস যোগ করে দেন। সে হিসেবে সে বছর তেরো মাসে এক বছর ধরা হয়ে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০০ সালে মিশরীয়দের তৈরি এ ক্যালেন্ডারই ছিলো মানব সভ্যতার প্রথম সফল

ক্যালেন্ডার। বর্তমান ক্যালেন্ডারে সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও ত্রিশ দিনে এক মাস, বারো মাসে এক বছর আর ৩৬৫ দিনে এক বছরের ধারণা এখনো প্রচলিত।

হাতের লেখার শুরু

মানুষ মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলো আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০)। কৃষিকাজ শুরু করার পর স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন ধরনের ফসল ও কৃষিকাজে সহায়ক পশুগুলোর হিসেব রাখার প্রয়োজনে মানুষ নানারকমের চিহ্ন ব্যবহার করা শুরু করলো। ওই চিহ্নগুলোই ছিলো মানুষের আদি অক্ষর। বর্তমান উত্তর ইরাকের যেখান থেকে কৃষিকাজের শুরু হয়েছিলো সেখান থেকেই শুরু হয়েছে হাতের লেখার মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান।

সংখ্যার ব্যবহার শুরু

হাতের লেখার শুরুই হয়েছিলো প্রধানত নিত্যপ্রয়োজনীয় হিসাব রাখার জন্য। সে হিসেবে বিভিন্ন ধরণের প্রতীকের সৃষ্টি। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সাল পর্যন্ত সংখ্যা গণনার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিলো না। সংখ্যা গণনার প্রথম যে সফল পদ্ধতির কথা জানা যায় তা ছিলো ষাটভিত্তিক। বর্তমান ইরাকের দক্ষিণ অংশের মানুষ এ পদ্ধতি সফল ভাবে ব্যবহার করেছে অনেকদিন। ব্যবহারের সুবিধার কারণেই ষাটভিত্তিক সংখা পদ্ধতি চালু হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। ৬০ কে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০ দিয়ে ভাগ করা যায়। এ সুবিধা ছাড়াও আরো একটি ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো ষাট ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থায়। সময়ের হিসেবে ষাট সংখ্যার গুরুত্ব অনেক। ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ঘন্টা। আবার মাসে ৩০ দিন হিসেবে ১২ মাসে এক বছর ধরলে ৩৬০ দিনে এক বছর হয় - যাকে ৬০ দিয়ে ভাগ করা যায়। একটি বৃত্তের মোট কৌণিক পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থান প্রতিদিন প্রায় এক ডিগ্রি পরিমাণ বদলে যায়। তখন অবশ্য মনে করা হতো যে পৃথিবী স্থির আর সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) ভিত্তিও রচিত হয় প্রায় এ সময়েই।

পদার্থের গঠন সম্পর্কিত ধারণা

বিশ্বব্রহ্মান্ড কী দিয়ে তৈরি - এ প্রশ্ন নতুন নয়। নানারকম প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার সাথে সাথে মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে নানাভাবে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তখন বেশির ভাগ উত্তরই ছিলো অনুমানভিত্তিক। তা ছাড়া নানারকম অলৌকিক অবাস্তব বিশ্বাস তো ছিলোই। কোন রকম সংস্কার বা পূর্বধারণার বশবর্তী না হয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে পদার্থের গঠন সম্পর্কিত প্রথম ধারণাটি আসে গ্রিক দার্শনিক থেইল্‌সের (Thales) কাছ থেকে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০ সাল)।

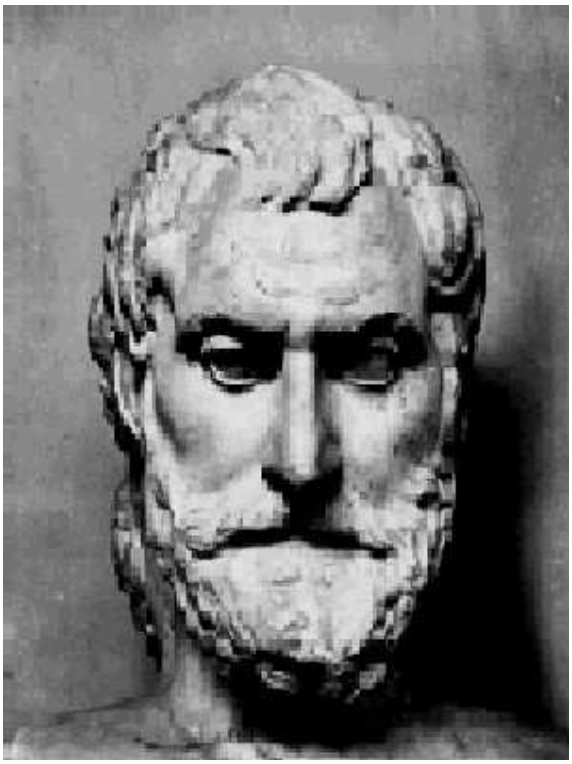

গ্রিক দার্শনিক থেইল্‌স

থেইল্‌স ধারণা দিলেন যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সব কিছুই একটি মৌলিক বস্তু থেকে তৈরি। পৃথিবী সহ সবকিছু যে অবস্থায় আছে ঠিক সে অবস্থায় তৈরি হয়নি। কোন সৃষ্টিকর্তা তা এভাবে তৈরি করে দেন নি। বরং সবকিছুই তৈরি হয়েছে পানি থেকে। এ পানি হতে পারে স্বাভাবিক পানি, অথবা হতে পারে পানির অন্য কোন পর্যায় - যেমন বাষ্প কিংবা বরফ। আজ আমরা সবাই জানি যে থেইল্‌সের ধারণা ভুল ছিলো। মহাবিশ্বের মূল উপাদান পানি নয়। কিন্তু থেইল্‌স বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রধান ধারণা তৈরি করে দিয়েছেন - তা হলো মৌলিক পদার্থের ধারণা। কোন বস্তুকে ভাঙতে থাকলে একটি পর্যায় নিশ্চয় আসবে - যখন বস্তুকে আর ভাঙা সম্ভব হবে না। এ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে থেইল্‌সের ধারণা থেকে। বিজ্ঞানের জগতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

মানবশরীরের প্রথম ব্যবচ্ছেদ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের শুরু থেকেই দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় আমাদের সমাজে। একশ্রেণীর মানুষ হলো খুবই রক্ষণশীল - কোন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতেই যারা পছন্দ করেন। তারা নিজেদের মনের মত করে যে কোন কিছুতেই নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ ধরণের মানুষেরা সব সময়েই বড় ধরণের বাধার সৃষ্টি করেন। আরেক শ্রেণীর মানুষ হলো মুক্তচিন্তার মানুষ, কৌতূহলী ও পরিশ্রমী মানুষ। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার জন্য বড় ধরণের ঝুঁকি নিতেও তারা প্রস্তুত। থেইল্‌সের ধারণার পর এসব অনুসন্ধিৎসু মানুষের কৌতূহল বেড়ে গেলো।

মানুষের শরীরের ভেতরে ঠিক কী কী আছে - কেমন করে এত নির্ভুল ভাবে আমাদের দেহযন্ত্র চলে তা দেখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন অনেকে। কাজটি সহজ ছিলো না। কারণ দেহের ভেতরে কী আছে তা দেখতে হলে শরীর কেটে দেখতে হবে। কিন্তু রক্ষণশীল মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সে পথ বন্ধ করে রেখেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানে গ্রিক দার্শনিকরা তখন প্রধান ভূমিকায়। এই গ্রিকেই আবার ধর্মীয় নিষেধের নানারকম বেড়াজাল। মৃতমানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধ। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি। কিন্তু এ ভয় কাটিয়ে অনেক কষ্টে মানুষের মৃতদেহ সংগ্রহ করে ব্যবচ্ছেদ করলেন গ্রিক ডাক্তার আল্কমেইয়ন (Alcmaeon)। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সাল) আল্কমেইয়নের করা ব্যবচ্ছেদই মানব দেহের প্রথম স্বীকৃত ব্যবচ্ছেদ।

আল্কমেইয়ন শিরা ও ধমনীর পার্থক্য দেখতে পান এবং মস্তিষ্কের সাথে শরীরের অন্যান্য অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের সংযোগ যে স্নায়ুর মাধ্যমে ঘটে তার ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করেন। এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি আল্কমেইয়নের পরীক্ষা থেকে। কিন্তু তাঁর পরীক্ষার পরে আরো অনেকেই সাহসী হয়ে এগিয়ে আসেন মানব শরীর ব্যবচ্ছেদ করার জন্য। আল্কমেইয়নের পরীক্ষা তাই শুধুমাত্র মানব শরীর গবেষণার নতুন পথ খুলে দেয়নি - অযৌক্তিক ধর্মীয় নিষেধের বিরুদ্ধেও একটি জোরালো ভূমিকা রেখেছে।

অ্যাবাকাস

সংখ্যার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গাণিতিক ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে মানুষের। ষাটভিত্তিক সংখ্যার বদলে দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ যোগ বিয়োগ ও গুণ ভাগ করার জন্য মানুষ নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি সুবিধাজনক যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। তা হলো অ্যাবাকাস (Abacus) - যাকে আমরা আদিযুগের কম্পিউটার বলতে পারি। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাঁদের বড় বড় হিসেবের কাজে অ্যাবাকাস ব্যবহার করে আসছিলো।

অ্যাবাকাসের গঠন খুবই সাধারণ। একটি আয়তাকার ফ্রেমে সমান্তরাল ভাবে কিছু দড়ি লাগানো থাকে। প্রত্যেক দড়িতে কিছু গুঁটি আটকানো থাকে। দশ ভিত্তিক সংখ্যায় প্রত্যেক দড়িতে দশটি করে গুঁটি থাকে। সবচেয়ে নিচের সারির গুঁটির মান এক, তার উপরের সারির গুঁটির মান দশ, তার উপরের সারির মান একশ এভাবে যতই উপরের দিকে যাওয়া হয়, সংখ্যার মান বাড়তে থাকে। দশমিক পদ্ধতিতে আমরা যে নিয়ম ব্যবহার করি - অ্যাবাকাসের সাহায্যে ঠিক সে নিয়মেই কাজ করা হয়, তবে অনেক দ্রুতবেগে। আজ থেকে আড়াই বছর আগে অ্যাবাকাসের ধারণা ছিলো প্রযুক্তির পথে একটি অসাধারণ পদক্ষেপ।

পরমাণুর ধারণা

সকল বস্তুই পানি থেকে তৈরি বলে গ্রিক দার্শনিক থেইল্‌স যে ধারণা দিয়েছিলেন তা খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কিন্তু বস্তুর মূল উপাদান খুঁজে বের করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছিলো। থেইল্‌সের ধারণার প্রায় একশ চল্লিশ বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৪৪০ সালে আরেকজন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus) বস্তুর গাঠনিক উপাদান সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা দেন। ডেমোক্রিটাসের মতে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই একটি মৌলিক উপাদান থেকে তৈরি। যে কোন বস্তুকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এক সময় এমন একটা অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব যখন বস্তুর সে অবস্থাকে আর ভাঙা সম্ভব হবে না। বস্তুর এই অবিভাজ্য অংশটিই হলো বস্তুর মূল উপাদান। এরকম অবিভাজ্যতার গ্রিক নাম এ্যাটম (atom), যার বাংলা পরিভাষা হলো পরমাণু।

ডেমোক্রিটাসের ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়নি সেসময়। কারণ পদার্থকে বার বার ভাঙতে থাকলে যে অতি ক্ষুদ্র আকারের পদার্থ পাওয়া যায় সেরকম অতি ক্ষুদ্র জিনিস খুঁটিয়ে দেখার মত যান্ত্রিক সুবিধা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ডেমোক্রিটাসের ধারণা পরবর্তীতে অনেকটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পরমাণুর তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন সহ বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখা।

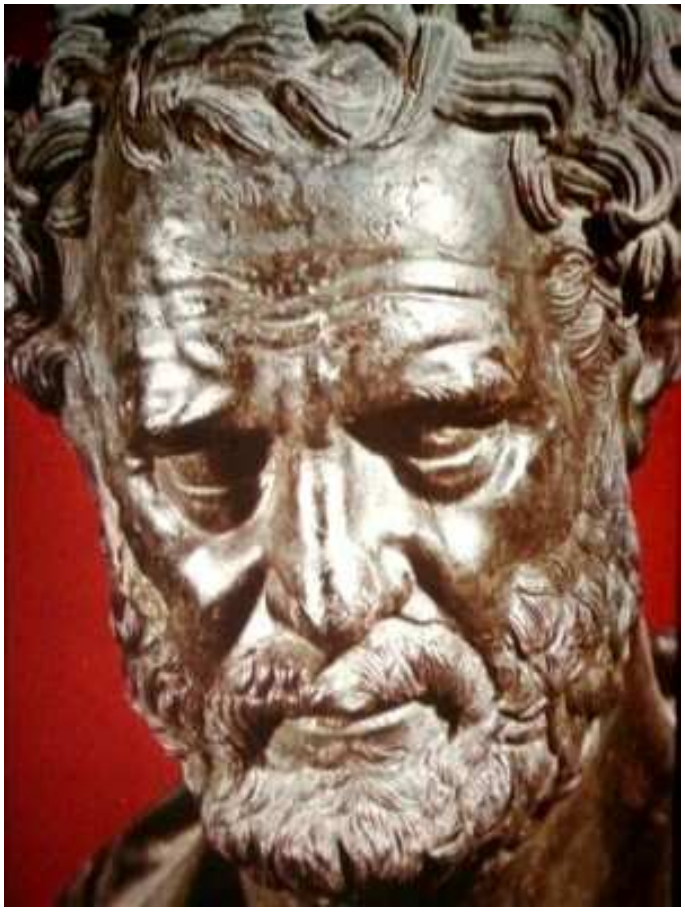

গ্রিক বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস

নক্ষত্রের ম্যাপ

রাতের আকাশ জুড়ে তারার মেলা দেখতে দেখতে মানুষ তাদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন দিনের পর দিন। তখনো কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ধারণা আসেনি মানুষের মনে। খালি চোখেই যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে নক্ষত্রপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য ম্যাপ তৈরি করেন গ্রিক গণিতবিদ ইউডোক্সাস (Eudoxus) খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে। এর আগে তিনি পৃথিবীর ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। ইউডোক্সাসের তৈরি ম্যাপে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হয় অক্ষাংশ (latitude) ও দ্রাঘিমাংশ (longitude)।

গ্রিক গণিতবিদ ইউডোক্সাস

ইউক্লিডের জ্যামিতি

মিশরের পিরামিড তৈরি হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫০ সালে)। চারশ ফুট লম্বা, সাড়ে তিনশ ফুট চওড়া ও প্রায় দুশ ফুট উঁচু এই বিশাল বিশাল পিরামিডগুলোর স্থাপত্যের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে সময়ের স্থপতি ও নির্মাণ শ্রমিকদের জ্যামিতিক জ্ঞান ছিলো বেশ উঁচুমানের। তবে সে জ্যামিতিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে। পরবর্তী দুহাজার বছর মানুষের জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রচার বা প্রসার খুব বেশি ঘটেনি। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের দিকে গ্রিক গণিতবিদ ইউক্লিড (Euclid) জ্যামিতিক জ্ঞান প্রসারে একটি বিরাট পদক্ষেপ নেন। তিনি রচনা করেন জ্যামিতির প্রথম বই এলিমেন্টস (Elements)।

ইউক্লিডের এলিমেন্টস বস্তুবাদী জ্ঞানের জগতে একটি যুগান্তকারী সংযোজন। এলিমেন্টস বইতে ইউক্লিড সেই সময় পর্যন্ত যতগুলো জ্যামিতিক ধারণা জানা ছিলো তার সবগুলোকে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকগুলো নতুন উপপাদ্যের সংযোজন করে একটি নতুন ধারার জ্যামিতির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন ইউক্লিড যা আমরা ইউক্লিডিয় জ্যামিতি বলে জানি।

গ্রিক গণিতবিদ ইউক্লিড

আর্কিমেডিসের সূত্র

মেকানিক্স বা বলবিদ্যার সূচনা ঠিক কখন হয়েছে তা বলা মুশকিল। ধরতে গেলে মানুষের যে কোন কাজই বলবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কাজে সুবিধা লাভের জন্য মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি ও তা ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। চাকা আবিষ্কার মানুষকে বিশাল যান্ত্রিক সুবিধা এনে দিয়েছে। যানবাহন আবিষ্কারের অনেক আগেই চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

চাকার মতোই আরেকটি যান্ত্রিক সুবিধা হলো লিভার (lever) ও ফালক্রাম (fulcrum)। গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস (Archimedes) লিভার ও ফালক্রামের ব্যবহারের ফলে বল ও শক্তির পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট গাণিতিক হিসাব করতে সমর্থ হন খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ সালে। যদিও ফোর্স (force) বা বলের সঠিক ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি আরো আরো প্রায় দুহাজার বছর পরে নিউটনের কাছ থেকে। ধরতে গেলে আর্কিমেডিসের হাতেই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের সূচনা হয়। আর্কিমেডিস প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে খুব ভারী কোন বস্তুকেও দূর থেকে সামান্য ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দেয়া যায়। তারজন্য দরকার লম্বা কোন কাঠি যা দিয়ে ধাক্কা দেয়া যাবে। কাঠির দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে ধাক্কায় জোর লাগবে ততো কম। গাণিতিক হিসেবের ওপর ভিত্তি করেই আর্কিমেডিস বলেছিলেন, ‘‘আমাকে একটি লিভার আর পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা দিলে আমি পৃথিবীকে সরিয়ে দিতে পারি’’।

আর্কিমেডিস এসময় তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্লবতা (buoyancy) বিষয়ক যুগান্তকারী সূত্র আবিষ্কার করেন যা আর্কিমেডিসের সূত্র নামে পরিচিত। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে কোন বস্তুকে তরল বা বায়বীয় পদার্থে ডোবালে বস্তুটি হাল্কা মনে হয় - মানে ওটা কিছুটা ওজন হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়। বস্তুর এই হারানো

ওজন - বস্তুটি যে পরিমাণ তরল বা বায়বীয় পদার্থ অপসারণ করে - সে পরিমাণ তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান। এ হিসেব কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে অনেক কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে।

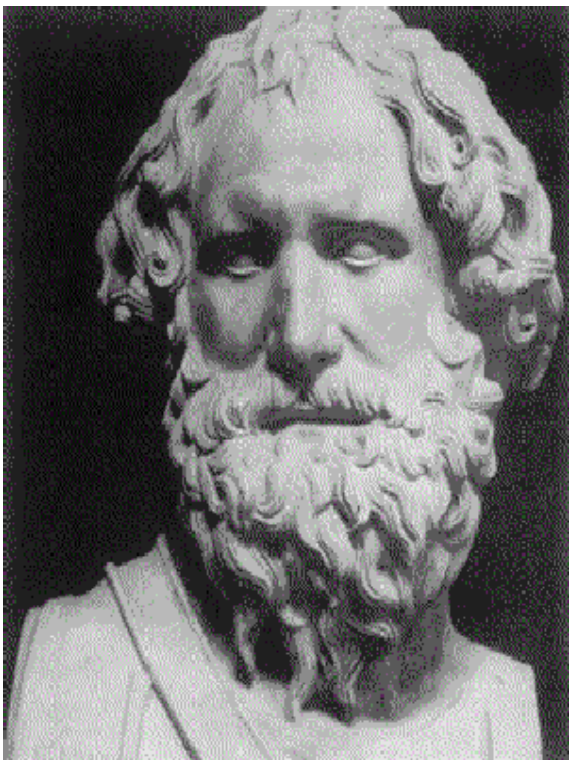

গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস

পৃথিবীর পরিধি

যে কোন বিজ্ঞানেরই প্রথম ভিত্তি হচ্ছে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং তার সঠিক বিশ্লেষণ। বর্তমানে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য অনেক রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। আজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস দেখার জন্য আছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দেখার জন্য আছে শক্তিশালী টেলিস্কোপ। দেখার পরে তথ্য ও উপাত্ত (ডাটা) বিশ্লেষণ করার জন্য আছে আধুনিক কম্পিউটার। কিন্তু আজ থেকে দুহাজার বছরেরও বেশি সময় আগে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ সাল) এরকম কোন সুবিধার কথা মানুষ চিন্তাও করতে পারেনি। সেই সময়েই মিশরের বিজ্ঞানী ইরাটোস্থেনিস (Eratosthenes) সময়ের সাথে সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের পরিমাপ নির্ণয় করেন।

ইরাটোস্থেনিস দেখেন যে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের অবস্থান পৃথিবীর একেক জায়গায় একেক রকম। মিশরের দক্ষিণ-পুর্ব আলেকজেন্ড্রিয়ার সায়ান (Syene) (বর্তমানে মিশরের আসোয়ান (Aswan)) শহরে দুপুর বারোটায় সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। অর্থাৎ সূর্য রশ্মি লম্বভাবে ভূমিতে পড়ে। কিন্তু ইরাটোস্থেনিস লক্ষ্য করলেন যে একই দিনে একই সময়ে আলেকজান্ড্রিয়া শহরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে না। সূর্য রশ্মি ভূমিতে পড়ার সময় প্রায় সাড়ে সাত ডিগ্রি কোণে সরে যায়। পার্থক্য খুব বেশি নয়। কিন্তু ইরাটোস্থেনিস এই কৌণিক পার্থক্যকেই কাজে লাগালেন।

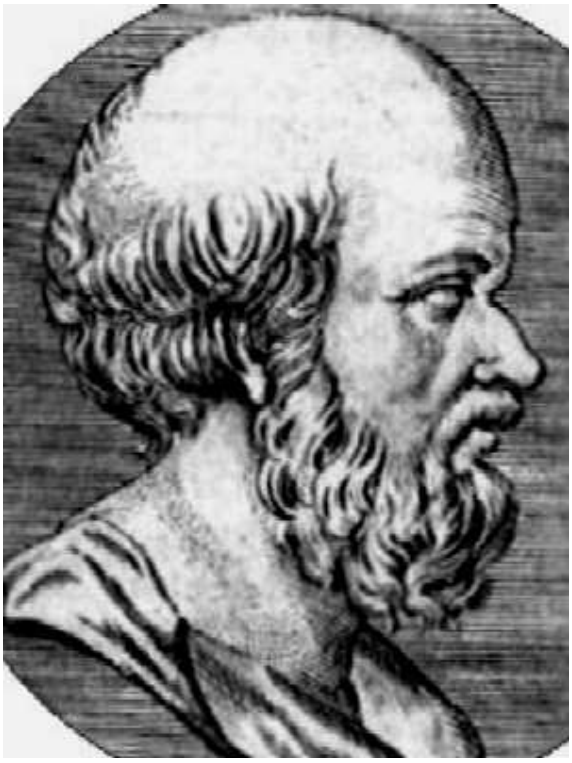

মিশরীয় জ্যোতির্বিদ ইরাটোস্থেনিস (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৬ - খ্রিস্টপূর্ব ১৯৪)

ইরাটোস্থেনিস পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে সূর্যের অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। সে কারণে সূর্যের আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর সময় পরস্পর সমান্তরাল ভাবে এসে পড়ে। এরিস্টটল সহ আরো কয়েকজন দার্শনিক ইতোমধ্যেই মত প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবী একটি বিরাট আকারের গোলক। ত্রিমাত্রিক গোলককে সমতলভাবে দেখলে একটি বৃত্তের মতো দেখা যাবে। বৃত্তের মোট কৌণিক পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। সায়ান ও আলেকজান্ড্রিয়া শহরের সূর্যরশ্মির কৌণিক পার্থক্য সাড়ে সাত ডিগ্রি। সাড়ে সাত ডিগ্রি ৩৬০ ডিগ্রির প্রায় ৫০ ভাগের এক ভাগ। তাহলে পৃথিবীর পরিধি হবে সায়ান ও আলেকজান্ড্রিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের ৫০ গুণ।

ইরাটোস্থেনিসের সময়ে সায়ান ও আলেকজান্ড্রিয়ার দুরত্ব ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার স্ট্যাডিয়া (stadion)। সে হিসেবে পৃথিবীর পরিধি হলো প্রায় ২৫০,০০০ স্ট্যাডিয়া। দূরত্ব মাপার তখনকার একক এক স্ট্যাডিয়ন সমান প্রায় ৫২১.৪ ফুট। সুতরাং ইরাটোস্থেনিসের হিসেব মতে পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৩,৯৯০ মাইল এবং ব্যাস প্রায় ৭,৫৭৯ মাইল। বর্তমানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানি পৃথিবীর পরিধি ২৪,৮৮৮.৬৪ মাইল ও ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল। ইরাটোস্থেনিসের হিসেবের সাথে এই মাপের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় ছাড়াও আরো কিছু যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন ইরাটোস্থেনিস। খালি চোখে দৃশ্যমান তারাগুলোর একটি আধুনিক তালিকা তৈরি করেছিলেন ইরাটোস্থেনিস। তিনিই প্রথম ক্যালেন্ডারে লিপ-ইয়ারের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করেন। ইরাটোস্থেনিসকে মনে করা হয় বিশ্বের প্রথম সফল জ্যোতির্বিদ।